কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 16 AUG 2015
পৃষ্ঠা ... ১৫ ... কলাম ... ২

এ কে এম শাহনাওয়াজ

# বঙ্গবন্ধুর বৈশ্বিক ভাবনায় বি ও বর্তমান বাস্তবতা

দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত শিক্ষকরা প্রায়ই মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারছেন না। জাতীয় দলের বড়-মাঝারি নেতাদের খুশি রাখতে ব্যস্ত থাকতে হয় তাঁদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতিতে যুক্ত বড় দলগুলোর প্রধান লক্ষ্য থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যাতে নিজ দল থেকে হন। এ জন্য তাঁরা দিনের পর দিন ধরনা দিতে থাকেন নেতা-নেত্রীদের কাছে। নিজ দলের ছাত্রদেরও কাজে লাগান



একজন ক্ষণজন্মা মানুষ সবার পাশে যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ তাঁর মূল্য তেমন স্পষ্ট থাকে না। মানুষটিকে হারিয়ে ফেললে তখন অভাব প্রকট হয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু তাঁর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে অনেক দূরদর্শিতা নিয়ে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। অন্য অনেক দিকের মতো শিক্ষাঙ্গন নিয়ে তাঁর ভাবনা ছিল অনেক বেশি শাণিত। বর্তমান সময়ের আমলাতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ আর মর্যাদাবান অঞ্চল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর দূরদর্শিতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষার্থী আর শিক্ষককে বৈশ্বিক মানে নিয়ে যেতে না পারলে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে জাতি গঠন ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো সম্ভব হবে না। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর আলাদা ভাবনা ছিল। শিক্ষা-গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয় যাতে বিশ্ব মানের অবস্থানে পৌঁছতে পারে সেই ভাবনা তাঁকে তাড়িত করেছে।

বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই করেছেন আজীবন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মুক্তচিন্তার চর্চা ছাড়া জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজন গণতান্ত্রিক ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক দেশের সীমায় গণ্ডিবদ্ধ থাকবেন না—তাঁরা বিশ্বজ্ঞানের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করবেন। এই চিন্তা বাস্তবায়ন করার জন্য আর দশটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো বিশ্ববিদ্যালয়কে আমলাতান্ত্রিক নিয়মে বন্দি দেখতে চাননি। অবশ্য ততক্ষণে মুক্তচিন্তার অনেক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার দাবি করছিলেন। বঙ্গবন্ধু অমন দাবির বস্তুনিষ্ঠতা অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর অভিপ্রায়েই পাস হয়েছিল ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ। এই অধ্যাদেশের আওতায় ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চলে আসে। উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ধারায় যেন এই বিদ্যাপীঠগুলো পরিচালিত হতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে থাকবে না সরকার বা রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ। জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি এ অঞ্চলের ছাত্র-শিক্ষকরা রাজনীতি সচেতনও থাকবেন। রাজনীতি চর্চাও করবেন নিজেদের আঙ্গিকে। এভাবে মেধাবী প্রজন্মের চারণভূমি হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর অনেক সম্ভাবনার মতো বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল তা নির্বাপিত হলো। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ বহাল রইল। কাগজে-কলমে গণতান্ত্রিক ধারাগুলোও রইল। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন থেকে মুক্তবিবেক একটি রিমোট কন্ট্রোলে রূপান্তরিত হয়ে জাতীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রকদের হাতে চলে গেল। আজ বুঝতে পারি বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে এই অনাচারটি হতে পারত না।

বাহ্যিকভাব ১৯৭৩ সালের আইন অনুসারে গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে বহাল আছে কিন্তু এর নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে একটি অসুস্থ রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে। এর ফলে ও প্রতিক্রিয়ায় মেধাচর্চার স্বাভাবিক পথ জটিল হয়ে উঠছে।

পাকিস্তান আমল থেকে ও বাংলাদেশ আমলের অনেকটা সময় পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ অর্থাৎ ডাকসু, রাকসু, জাকসু ও হল সংসদগুলো বহাল ছিল। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থী ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নিজেদের নেতৃত্ব তৈরি করত। এতে যেমন ছাত্রদের মধ্যে সুস্থ রাজনীতির চর্চা হতো তেমন ছাত্রকল্যাণের পক্ষে নানা দাবি নিয়ে লড়াই করার পথ উন্মুক্ত থাকত। এখন ক্ষমতাসীন দলগুলোর নিয়ন্ত্রণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বজায় রাখার জন্য এসব দলের অঙ্গ তথা সহযোগী সংগঠনসমূহ উন্মত্ততা ছড়ায়। গণতান্ত্রিক কাঠামো বহাল থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ধাপগুলোয় এখনো শিক্ষকদের ভোটাধিকারের সুযোগ রয়েছে। ভোটের মাধ্যমে ডিন নির্বাচিত হয়, শিক্ষক সমিতির নির্বাহী পর্ষদ গঠিত হয়; সিনেট, সিন্ডিকেটের বেশ কয়েকটি সদস্যপদ নির্বাচিত হয় আর সবশেষে সিনেটরদের ভোটে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচিত হয়। দুর্ভাগ্য এই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত গণতান্ত্রিক কাঠামোটি ঠিক থাকলেও এর প্রায়োগিক শক্তিটি চলে গেছে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের হাতে। তাদের ম্যাকানিজমে ভোট নিয়ন্ত্রণের নানা উপায় কার্যকর থাকে।

বঙ্গবন্ধু-উত্তর সব রাজনৈতিক সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে দাবার ঘুঁটিতে পরিণত করেছে। ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির নেতিবাচক দিক এখন সবার সামনে স্পষ্ট। কিছু প্রশ্ন, যেমন ১. ছাত্ররাজনীতিতে মেধাবীদের অংশগ্রহণ শূন্যের কোঠায় চলে যাচ্ছে কেন? ২. মেধাবী দু-চারজন ছাত্ররাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার পর মেধাচর্চার বদলে পেশিচর্চার ব্যস্ত হয়ে পড়ে কেন? ৩. রাজনীতির বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী প্রার্থী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান কেন? ৪. নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা না হলেও এর জন্য কোনো জবাবদিহিতা থাকে না কেন? ৫. বিভিন্ন সংঘাতে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্ধারিত বন্ধ হয়ে যায় কেন? এর উত্তর মুক্ত ভাবনার সব মানুষেরই জানা। অথচ রাজনীতির ফায়দা নেওয়ার জন্য রাজনৈতিক সরকারগুলো এই অসুস্থ রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের নেতা-নেত্রীরা সব জানেন, কিন্তু সত্যটি বলতে চান না। হাজার হাজার পরিবারের সন্তানের শিক্ষাজীবন জাহান্নামে যাক তাতে ক্ষমতাসীনদের কিছু যায়-আসে না। রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে পেলেপুষে রাখতে শিক্ষাঙ্গনের অসুস্থ রাজনীতি।

সুস্থধারার রাজনীতির বিপক্ষে কে কবে কথা বলেছে সুস্থধারার রাজনীতি যত দিন বহাল ছিল তত দিন রাজনীতিসংশ্লিষ্ট ছাত্ররা চাঁদাবাজ হিসেবে পরিচিত ছি হল দখল করা আর অস্ত্র হাতে বিরুদ্ধ মতের বন্ধু ওপর হামলে পড়াটা অধিকারের পর্যায়ে পৌঁছেছি হলের গেট বন্ধ করে সাধারণ ছাত্রের পরীক্ষা ক্ল শিকেয় তুলে মিছিলে আসতে বাধ্য করত? নিজে অন্যায়-আবদার না মানলে প্রশাসনকে বিপর্যস্ত ক তুলত?

লেজুড়, অঙ্গ বা সহযোগী যে নামেই ডাকা হোক না কে গত কয়েক দশকে জাতীয় রাজনৈতিক দলের অঙ্গীভূ সংগঠনগুলো দেশবাসীর সামনে মহৎ কোনো দৃষ্টান্ত নি দাঁড়াতে পারেনি। বরঞ্চ উল্টোটিই হয়েছে। কোনে রাজনৈতিক দলের অঙ্গ বলে সংগঠনটির নেতাকর্মীদে ঠাটবাট আর পেশিশক্তি বেড়েছে। অঙ্গ বা সহযোগী যা বলা হোক, এসব সংগঠনকে যে আমাদের রাজনৈতি দলগুলো অতি জরুরি লাঠিয়াল মনে করে—এ আর এখ লুকোছাপা নেই। দীর্ঘদিন গণতন্ত্র চর্চা না করা দলগুলো আত্মশক্তি তলানিতে ঠেকেছে। তাই তারা নানা নামে লাঠিয়াল ছাড়া টিকে থাকা, আন্দোলন গড়ে তোলা ব নির্বাচনী বৈতরণী পাড়ি দিয়ে ক্ষমতার মকসুদে পৌঁছ অসম্ভব বিবেচনা করে। মূল দলকে সুসংগঠিত করার বদলে অঙ্গসংগঠনের প্রতি বেশি ভরসা করতে দেখে মনে হয়, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর বোধ হয় অঙ্গহানি হয়েছে। দুই পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ায় অঙ্গসংগঠনের ঘাড়ে ভর দিয়ে হাঁটতে চায়।

দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত শিক্ষকরা প্রায়ই মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারছেন না। জাতীয় দলের বড়-মাঝারি নেতাদের খুশি রাখতে ব্যস্ত থাকতে হয় তাঁদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতিতে যুক্ত বড় দলগুলোর প্রধান লক্ষ্য থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যাতে নিজ দল থেকে হন। এ জন্য তাঁরা দিনের পর দিন ধরনা দিতে থাকেন নেতা-নেত্রীদের কাছে। নিজ দলের ছাত্রদেরও কাজে লাগান। উপাচার্য প্রার্থীদের তিনজন প্যানেলে নির্বাচিত হওয়ার পর ছোটাছুটি আরো বেড়ে যায়। যে ধরনের ম্যাকানিজম থাকে তাতে সাধারণত সরকারি দলের রাজনীতিতে যুক্ত শিক্ষকদের সিনেটরদের ভোটে জেতার রেট বেশি। প্যানেলে একাধিক সরকারদলীয় শিক্ষক নির্বাচিত হলে দৌড়ঝাঁপের মাত্রা বেড়ে যায়। কারণ তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে মাননীয় রাষ্ট্রপতি মনোনীত করবেন। আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি যেহেতু কার্যত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই সিদ্ধান্ত দেন, তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে থাকেন দলীয় রাজনীতির

---

## মঞ্চ

**শিল্পকলা একাডেমি**
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

- বদনাম : সন্ধ্যা ৭টা, জাতীয় নাট্যশালার মূ থিয়েটার হল, সংলাপ গ্রুপ থিয়েটার।
- ঘরজামাই : সন্ধ্যা ৭ট এক্সপেরিমেন্টাল থিয়ে হল, ঢাকা থিয়েটার
- অমাবস্যা : সন্ধ্যা ৭ট স্টুডিও থিয়েটার হল, নাট্যপুরাণ।

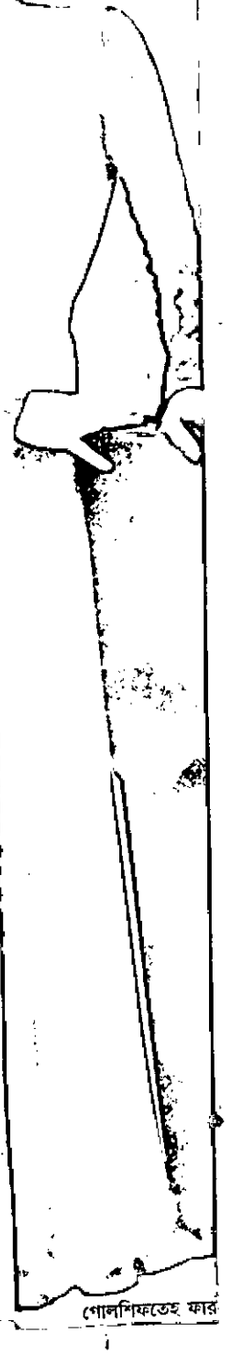

গোলশিফতেহ ফার